ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা প্রমুখের দাবি অনুসারে ভারতে সামন্তপ্রথা ছিল কি ছিল না, সে বিতর্কের নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন। কারণ সামন্ত প্রথার কালগত কাঠামো সম্বন্ধেই ঐতিহাসিকরা সহমত নন। ৬৫০—১০০০ খ্রিস্টাব্দের কাল যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এক অর্থনৈতিক সংকটের যুগ এই ধারণা সমর্থন করা দুষ্কর। রামশরণ শর্মা তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় ৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের কালপর্বে নগরের অবক্ষয়ের পেছনে সামন্ততন্ত্রের ভূমিকা দেখলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, নগরের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যা পরবর্তীকালে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য ও নগরায়ণের পথ প্রশস্ত করে। ড. শর্মার মতে, এই আমলে নগরজীবনের সংকোচন ও কৃষির প্রসার পাশাপাশি চলছিল। ফলে অর্থনীতির সামগ্রিক অবক্ষয়ের ধারণা ড. শর্মা নিজেও অনেকটা বদলে নিয়েছেন। ৬৫০—১২০০ খ্রিস্টাব্দ মূলত কৃষির ব্যাপক প্রসার দ্বারা চিহ্নিত। এই সময়কালে অর্থনৈতিক মন্দার চেয়ে তার প্রাণবন্ত চরিত্রই বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। কৃষি অর্থনীতির প্রসার বহু স্থানীয় শক্তির উত্থানের পথ সুগম করে।

কৃষি অর্থনীতির প্রসার

তাই বলা যায়, ড. শর্মার সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কিত তত্ত্বটি অনেক ঐতিহাসিক মানতে পারেন নি। ভারতে ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার ধরনের কোন ব্যবস্থা আদৌই ছিল না এ প্রশ্ন অনেক ঐতিহাসিক তুলেছেন। একাধিক ঐতিহাসিক একে ঠিক পুরোপুরিভাবে সামন্তপ্রথা না বলে 'প্রায় সামন্তপ্রথা' বা 'আংশিক সামন্ত প্রথা' (quasi feudalism) বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথা বলা যায় যে, আক্ষরিক অর্থে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব না থাকলেও আদি মধ্যযুগে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

[খ] নগর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রাম্যমান ব্যবসাপ্রথা, মুদ্রাব্যবস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক, কারিগরী, গিল্ডপ্রথা, শিল্প উৎপাদন (Urban centers, trade and trade networks, itinerent trade, coinage and currencies, trade contacts with South-East Asia and West Asia, crafts, guilds and industries) ঃ

আদি-মধ্য যুগে নগরায়ণ (Urban centers in the Early Medieval Period) ঃ প্রাচীন ভারতে নগরায়ণের প্রথম পর্ব দেখা দিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায় (খ্রিঃ পূঃ ২৩০০—১৭৫০)। হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি ছিল ভারতের প্রথম নগরায়ণের দৃষ্টান্ত। এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত প্রধান চারটি নগর ছিল মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, লোথাল ও কালিবঙ্গান। এছাড়াও অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর শহরের অস্তিত্ব দেখা যায়। খ্রিঃ পূঃ ২৩০০ থেকে প্রায় ছয়শ বছর ধরে বিরাজ করে খ্রিঃ পূঃ ১৭৫০ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি বিলুপ্ত হয়। হরপ্পার আমলে সুশৃঙ্খল, বহু বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ শহর-প্রধান অর্থনীতির যে

Scanned by CamScanner

ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বিচ্ছেদ ঘটেছিল ১৭৫০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ। হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের পর প্রায় হাজার বছর ভারত উপমহাদেশে কোথাও শহরের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। ঋগ্‌বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে নগর ছিল অনুপস্থিত। হরপ্পা সভ্যতার যে নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবন দেখা গিয়েছিল, খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় সেই জাতীয় নগরজীবন আবার ভারতে দেখা যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে যে নূতন অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তার অন্যতম ফলশ্রুতি মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরের আবির্ভাব। খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক ভারতে নগরায়ণের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করে। দ্বিতীয় নগরায়ণের বিকাশকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল বলে ধরা হয়। এই পর্বের নগরগুলির অধিকাংশ ছিল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্র বিশেষ। এযুগের নগরগুলি ছিল বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমি-সম্পন্ন, যে ভূমির কৃষি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এই সময়কার নগরগুলি কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথের ধারে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু সভ্যতার নগর ও পরবর্তীকালের মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরগুলির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। হরপ্পীয় নগরগুলি খ্রিস্টপূর্ব ২৩৫০ থেকে খ্রি পূঃ ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত ছয়শো বছর স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু নগরের ধ্বংসাবশেষ আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পাওয়া যায়। এরপর প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারতে নতুন কোন নগরের কথা জানা যায় নি। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা আটশো বছর অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছিল। পরবর্তীকালে কোনো কোনো নগরের পতন হয় বা গুরুত্ব কমে যায় কিন্তু নগরজীবনে ছেদ পড়েনি। এর পরবর্তীকালে আদি মধ্যযুগে নগরায়ণের সূত্রপাত হয়। এই সময়কার নগরায়ণকে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় পর্বের নগরায়ণ বলেছেন।

তৃতীয় পর্বের নগরায়ণ

ড. রামশরণ শর্মা সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম বা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের গৌরবময় কাল বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ সময় বৈদেশিক বাণিজ্য সংকুচিত হতে থাকে, যার ফলে পূর্ববর্তী নগরগুলি ক্রমশ অবক্ষয়ের পথে যায়। তিনি ৬০০—১০০০ খ্রিঃ নগরের সার্বিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। নগরের সার্বিক অবক্ষয় ও আবদ্ধ গ্রামীন অর্থনীতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার তত্ত্ব ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মানেন না। এ ব্যাপারে লেখমালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি জোরালো সমালোচনা করেছেন। তবে তিনি শর্মার সঙ্গে একটি ব্যাপারে সহমত হয়েছেন। তা হল খ্রিস্টিয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ নগর অবক্ষয়ের পথে গিয়েছিল। কিন্তু এই অবক্ষয় সার্বিক কিংবা এই ঘটনা সামন্ততন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছিল সে ব্যাপারে তিনি ড. শর্মার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। একই সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, আদি মধ্যযুগে বহু পুরণো নগর টিকেছিল। দ্বিতীয় পর্বের বেরিলী জেলার প্রাচীন নগর অহিচ্ছত্র

নগর সভ্যতার অবক্ষয়

ষষ্ঠ শতকের পরেও ভালভাবে টিকেছিল। দিল্লি অঞ্চলে পুরানো শহরগুলির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। উত্তর প্রদেশের অত্রঞ্জিখেরার পতন ঘটেনি এবং বারানসী অবশ্য হয়নি। পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় বা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা হল আদি মধ্যকালীন ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরের ধারাবাহিকতা বর্তমান ছিল। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু নগর তাদের সমৃদ্ধি হারালেও ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই উত্তর ও মধ্য ভারতে পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশের অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। একেই তিনি তৃতীয় নগর নগরায়ণ বলে মনে করেন।

আদি মধ্যযুগে ভারতের নগরায়ণের উপাদান খুবই অল্প। এ ব্যাপারে লেখমালা ও মুদ্রা আমাদের সাহায্য করে। বিভিন্ন লেখমালা থেকে আদি মধ্যকালীন নগরগুলির খোঁজখবর পাওয়া যায়। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাহায্যে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগে বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্র, উত্তর প্রদেশের অত্রঞ্জিখেরা, বারানসীর নিকটস্থ রাজঘাট, বিহারের চিরন্দ, হরিয়ানার পেহোয়া, গোপাদ্রি, সিয়াডোনী, বুলন্দ শহরের নিকট তত্ত্বানন্দপুর প্রভৃতি নগরের উজ্জ্বল অস্তিত্বের কথা বলেছেন। হরিয়ানার কর্নাল জেলার পেহোয়া বা প্রাচীন 'পৃথুদক'-এ একটি অধিষ্ঠান বা নগরের অস্তিত্ব ৮৮২—৮৮৩-র খ্রিস্টাব্দের লেখতে জানা যায়। এই নগরটি গুর্জর-প্রতিহারদের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নগরটি নিগম বলেও লেখতে অভিহিত। এই 'পৃথুদক' ছিল উত্তরাপথের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ঘোড়ার মেলা ও সংশ্লিষ্ট বণিকদের পরিচয় লেখতে পাওয়া যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যতম নগর ছিল তত্ত্বানন্দপুর। এই নগরটির অবস্থান বর্তমান উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরের কাছে ছিল। ৮৭৬ থেকে ৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ দশটি লেখ থেকে 'তত্ত্বানন্দপুর' সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই বসতি যে পুরোদস্তুর নগর ছিল তার প্রমাণ 'পুর' ও 'পত্তন' শব্দ দুটির প্রয়োগ। লেখমালা থেকে এই নগরের ছোটি ও বড় রাস্তা ('কুরথ্যা' ও 'বৃহদ্রথ্যা') এবং বাজারে যাবার পথ ('হট্টমার্গ'), শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত বাজার ('পূর্বহট্টপ্রদেশ'), বাসগৃহ ('গৃহ') ও দোকানের ('আবরী') তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়। নগরে ছয়টি মন্দির ছিল বলেও জানা গেছে। এই তত্ত্বানন্দপুর যে আদর্শ নগর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অহারের উৎখনন থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি থেকে। প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সিয়াডোনীতে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর লেখটিতে নগরায়ণের চরিত্র মূর্ত হয়েছে। ৯০৭—৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে এবং সিয়াডোনীকে 'পত্তন' বা শহর হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি মণ্ডপিকার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছাড়াও সিয়াডোনী যে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত তার প্রমাণ লেখটিতে পাওয়া যায়। ৮৭৫ ও ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের দুটি লেখ থেকে জানা যায় যে, গুর্জর-প্রতিহারদের ভূখণ্ডে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল গোপাদ্রি বা আধুনিক গোয়ালিয়র। এখানে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও তৈলিক

Scanned by CamScanner

শ্রেণির লোকদের সমাগম হয়। নগরের মধ্যে অন্তত দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র ('হট্টিকার') ছিল। নগরটি সম্ভবত প্রাকার বেষ্টিত ছিল। তার কারণেই নগরটি 'কোট্ট' বা কেল্লা বলে বর্ণিত হত। প্রতিহার রাজগণ নিযুক্ত 'কোট্টপাল' এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। 'বলাধিকৃত' বা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারি গোপাদ্রিতে উপস্থিত থাকতেন। এর থেকেই বোঝা যায়, এই নগর প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নগরগুলির মধ্যে পৃথুদকের তুলনায় সিয়াদোনী, তত্তানন্দপুর ও গোপাদ্রি অধিকতর সমৃদ্ধ ও পরিণত ছিল বলে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। সিয়াদোনী ও গোপাদ্রি ছিল শহর হিসাবে অগ্রগণ্য। সিয়াদোনী ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছাড়াও প্রশাসনিক গুরুত্ব পায়, এবং গোপাদ্রি সামরিক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের কাছে কলচুরি রাজ্যে নগরায়ণের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। করিতলাই থেকে পাওয়া দশক শতাব্দীতে উৎকীর্ন দ্বিতীয় লক্ষ্মণরাজের একটি লেখতে 'পুরপত্তন'-এর কথা জানা যায়। এছাড়া বিলহরি লেখতে ঐ অঞ্চলে বৃহদাকার 'পত্তনমণ্ডপিকার' কথা উল্লেখ আছে, যা কলচুরি রাজ্যে নগরের অস্তিত্বের পরিচায়ক। বিলহরিতে বহু দ্রব্যের আদান -প্রদান হত বলে জানা যায়, বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর ধার্য করা হয়। এই বিলহরি শহরে কৃষিজ সামগ্রী বেচাকেনা হত, পশ্চাদভূমি থেকে কৃষিজ পণ্য এই শহরে আমদানি করা হত। কৃষির সমৃদ্ধির পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল রাজস্থানের নাডোল শহর। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণায় দেখা যায় যে, নাডোল ছিল একটি গ্রাম, ধীরে ধীরে তা শহরে পরিণত হয়েছিল। বারোটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নাডোল বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র হয়েছিল। এখানে একটি মণ্ডপিকা বা বাজার গড়ে ওঠেছিল। কালক্রমে রাজস্থানের চহমান রাজারা এখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

কলচুরি রাজ্যে নগরায়ণ

দাক্ষিণাত্যে কৃষির প্রসার, বাণিজ্যের উন্নতি এবং কৃষিজ পণ্যের লেনদেন সম্ভবত নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণাটকের বেলগাঁও বা প্রাচীন বেলুগ্রামে বহুদূর-দূরান্তের বণিক এসে সমবেত হত। এখানে কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্য হত। বেলগাঁও ছিল ব্যস্ত ও সমৃদ্ধ নগর। চম্পকলক্ষ্মীর গবেষণা থেকে দক্ষিণ ভারতে চোল রাজ্য কুড়ামুককু—পালাইয়ারাই নামে এক যুগ্ম শহরের উত্থান ও বিকাশের কথা জানা গেছে। চম্পকলক্ষ্মীর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে খাদ্যের যোগান আসত, কৃষিজ পণ্য ও স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্যের লেনদেন হত। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর ও মন্দিরের চাহিদা এই শহর মেটাত। শহরটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বাইরে থেকে অনেক বণিক ও কারিগর এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসতি করে। মন্দির কর্তৃপক্ষও এদের উৎসাহ দিত। দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু শহর স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের মদতে ও মন্দিরের আওতায় বিকশিত হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে নগরায়ণ

১০০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই উত্তর ও মধ্যভারতে বেশ কিছু নগর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নগরায়ণে প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে সর্বভারতীয় রূপ নেয়। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের নগরগুলিকে তৃতীয় পর্বের নগরায়ণের অন্তর্গত বলে মনে করেন। ভারতে দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের মূল কেন্দ্র ছিল মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং ঐ অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে নগরায়ণ সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়। কিন্তু আদি মধ্যযুগে তৃতীয় পর্বের নগরায়ণের কোন মূল কেন্দ্র নেই। তৃতীয় পর্বের নগরগুলি বেশিরভাগ আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং স্থানীয় বাণিজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। স্থানীয় শক্তির বিকাশ ও স্থানীয় ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর উত্থান বিভিন্ন অঞ্চলে নগর গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। দ্বিতীয় পর্বের নগরগুলি যেমন অধিকাংশই বৃহদায়তন শক্তির কেন্দ্র ছিল, সে তুলনায় আদি মধ্যযুগের নগর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নানা স্তরের ও নানা প্রকারের স্থানীয় শক্তিকেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়েছিল।

তৃতীয় নগরায়ণ আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়

আদি মধ্যযুগের মুদ্রাব্যবস্থা (Coinage and currencies in the Early Medieval Period) : ড. রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন, ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের জন্য মুদ্রার ব্যবহার কমেছিল। এই সময়কাল ছিল তাঁদের মতে, সামন্ত প্রথার সক্রিয় যুগ। যদিও রামশরণ শর্মা ও বি. এন. এস. যাদব সাম্প্রতিক গবেষণায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দ্রুত বাণিজ্যিক প্রসারের কথা বলেছেন, ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. শর্মার মুদ্রা হ্রাসের তত্ত্ব মানেননি। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের ময়নামতী অঞ্চল উৎখননের ফলে প্রাপ্ত আদি মধ্যযুগের রৌপ্য মুদ্রার গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা নিয়মিত ব্যবহৃত হত। মুদ্রাগুলির একপিঠে বৃষমূর্তি ও অপরদিকে ত্রিশূলের ছাপ আছে। মুদ্রাগুলির ওপর হরিকেল (নোয়াখালি, কুমিল্লা এলাকা), পটিকেরা (পাইটকারা) প্রভৃতি জায়গার নাম খোদিত আছে। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান এই মুদ্রাগুলি আরকান ধাঁচে তৈরি হয়েছিল। দশম শতকের পর থেকে মুদ্রাগুলির গঠনে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুদ্রাগুলি আকারে বড় হয়, তাদের মাত্র একপিঠে নকশা আঁকা হয়। মুদ্রাগুলি আকারে বড়, পাতলা ও ওজনে হাল্কা হলেও তাদের ধাতুগত বিশুদ্ধতা বজায় ছিল।

ময়নামতীতে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রা

দশম শতকে মুদ্রাগুলির আকৃতি ও ওজনগত পরিবর্তন কেন ঘটল সে বিষয়েও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা উল্লেখের দাবি রাখে। এই সময়ে উত্তর ভারতে প্রচলিত মুদ্রাগুলি ছিল পুরাণ, ধরণ, কার্ষাপন ও দ্রম্ম। সমকালীন লেখমালায় ৫৭.৫ গ্রেন ওজন বিশিষ্ট এই মুদ্রাগুলির উল্লেখ আছে। দশম শতকে হরিকেলীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বদলে রৌপ্য মুদ্রাগুলিকে সম্ভবত উত্তর ভারতের দ্রম্ম, কার্ষাপন, পুরাণ প্রভৃতি মুদ্রার সঙ্গে ওজনের

Scanned by CamScanner